

# ছড়ার ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

## ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; বোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাতি নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজ সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে, এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাভীর গুমর রাখে না। অথচ, এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেলে, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উল্টো কথা বলে। এক হচ্ছে, আলোর রূপ চেউয়ের রূপ; আর হচ্ছে, সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ চেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা—

শমনদমন রাবণরাজা; রাবণদমন রাম

বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্তপ্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিতে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়; বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেইসব ভাবের উপযুক্ত যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না, পথে পথে— যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

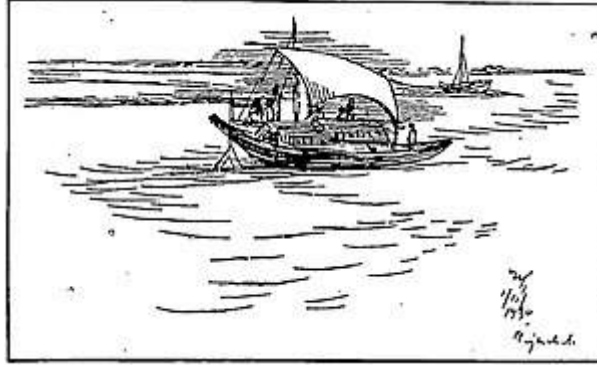
## সূচীপত্র

<u>জলযাত্রা</u>	<u>১</u>
<u>ভজহরি</u>	<u>৫</u>
<u>পিসনি</u>	<u>৮</u>
<u>কাঠের সিঙ্গি</u>	<u>১১</u>
<u>ঝড়</u>	<u>১৩</u>
<u>খাটলি</u>	<u>১৫</u>
<u>ঘরের খেয়া</u>	<u>১৯</u>
<u>যোগীনদা</u>	<u>২১</u>
<u>বধু</u>	<u>২৭</u>
<u>চডিভাতি</u>	<u>২৯</u>
<u>কাশী</u>	<u>৩২</u>
<u>প্রবাসে</u>	<u>৩৭</u>
<u>পদ্মায়</u>	<u>৪০</u>
<u>বালক</u>	<u>৪৩</u>
<u>দেশান্তরী</u>	<u>৪৫</u>
<u>অচলা বডি</u>	<u>৪৯</u>
<u>সধিয়া</u>	<u>৫৩</u>
<u>মাধো</u>	<u>৫৯</u>

<u>আতার বিচি</u>	<u>৬৩</u>
<u>মাকাল</u>	<u>৬৬</u>
<u>পাথরপিণ্ড</u>	<u>৬৯</u>
<u>তালগাছ</u>	<u>৭১</u>
<u>শনির দশা</u>	<u>৭৩</u>
<u>রিজ্ত</u>	<u>৭৬</u>
<u>বাসাবাড়ি</u>	<u>৭৮</u>
<u>আকাশ</u>	<u>৮১</u>
<u>খেলা</u>	<u>৮৫</u>
<u>ছবি-আঁকিয়ে</u>	<u>৮৬</u>
<u>অজয় নদী</u>	<u>৮৯</u>
<u>পিছু-ডাকা</u>	<u>৯১</u>
<u>ভ্রমণী</u>	<u>৯৫</u>
<u>আকাশপ্রদীপ</u>	<u>৯৭</u>

## জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই, মাঝি ডাকতে—  
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।  
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,  
তার আড়তে আসব বেচে ক্ষেতের নতুন কলাই।  
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিন-পোয়া,  
যদুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।  
পেরিয়ে যাব চন্দ্রনদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে—  
মালসি যাব, পুটকি সেথায় থাকে মায়ে বিয়ে।  
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুর-বেলার খাওয়া—  
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া  
এক পহরে চলে যাব মুখলুচরের ঘাটে,  
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।  
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন—  
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।



তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে  
ছাড়ব শয়ন ঝাড়ুয়ের মাথায় শুকতারটি দেখে।  
লাগবে আলোর পরশমণি পূব আকাশের দিকে,  
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।  
বাঁশের বনে একটি-দুটি কাক  
দেবে প্রথম ডাক।  
সদর পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ  
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।  
উসুখুসু করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,  
রাঙা রঙের ছোঁওয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।  
বোষ্টমি সে ঠুনুঠুন বাজারে মন্দিরা,  
সকাল-বেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়া ফিরা।

হেলেদুলে পোষা হাঁসের দল  
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।

আমারও পথ হাঁসের যে পথ, জলের পথে যাত্রী  
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।  
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,  
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদুরে।

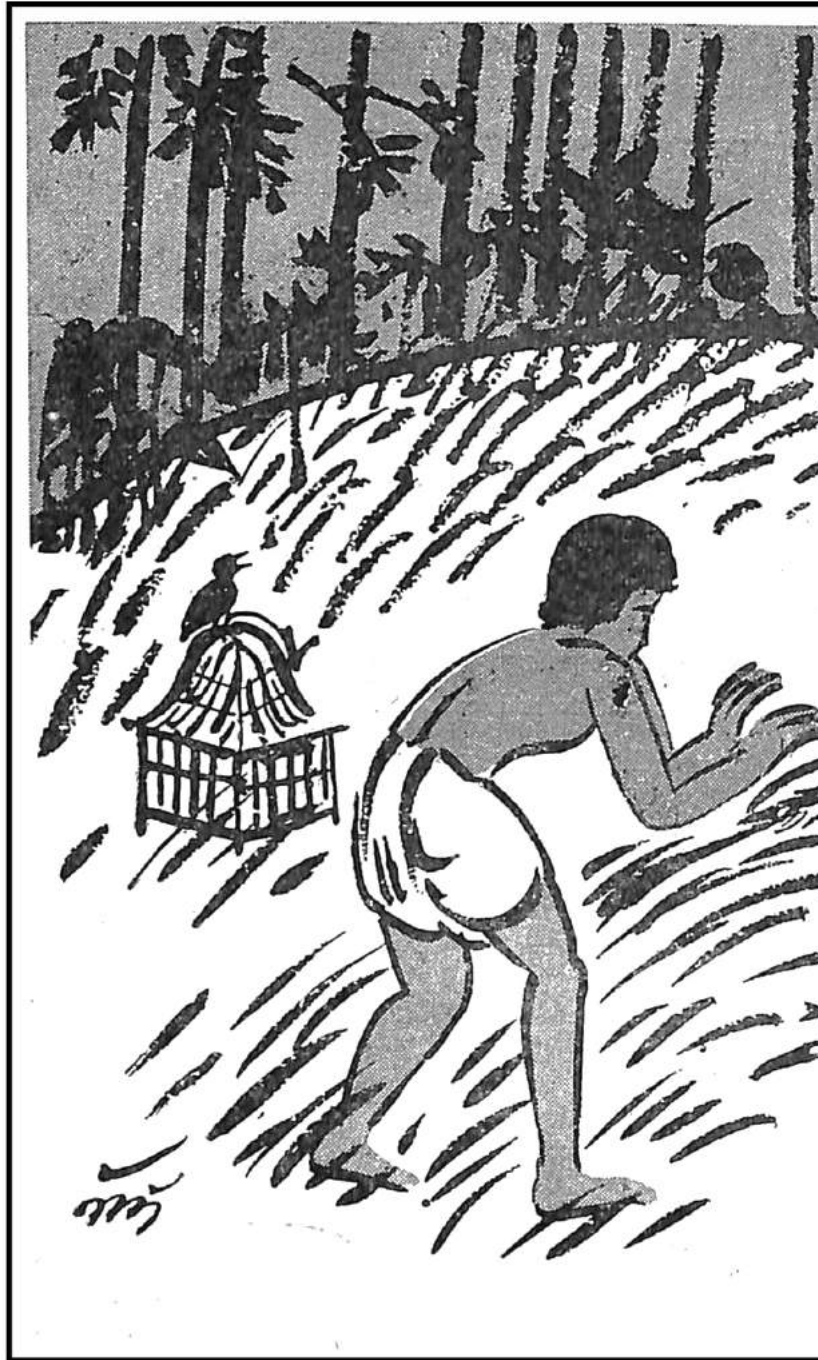
গিয়ে ভজনঘাটা  
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনেডাঁটা।  
পৌঁছব আটবাঁকে—

সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।  
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপন হাতে,  
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।  
মাখনাগায়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে—  
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।  
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্কে হবে,  
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাস্যরবে।

ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন  
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

আলমোড়া



# ডজহরি

হৃৎকণ্ঠে সারাৰছর আপিস করেন মামা—  
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা,  
                দিয়েছিলেন মাকে,  
ঢাকার নীচে যখন-তখন শিষ দিয়ে সে ডাকে।  
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক’রে  
                ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।  
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা  
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ব্যাপট দিত পাখা।

কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান—  
 অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।  
 ভজু বলত, ‘পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্তি,  
 আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।  
 ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,  
 পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।’



একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,  
 ‘গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্যা।’  
 শুনে আমার লাগল ভারী মজা—  
 এই আমাদের ভজা  
 এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে  
 রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।  
 সুধাই তাকে, ‘বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে?’  
 ভজু বললে, ‘খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান হবে!  
 কেউ বা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে—  
 নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।  
 মোটা মোটা ফড়িঙ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই—  
 ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।  
 এমনি হবে ধুম,  
 সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।  
 ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা—  
 কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।  
 পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্বকম—  
 শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।  
 আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে—  
 মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।  
 ডাকবে যখন টিয়ে  
 বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।’





### পিস্নি

কিশোর-গাঁয়ের পুরের পাড়ায় বাড়ি,  
পিস্নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।

একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো—  
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হল।  
আর-কোনো ঠাই হয়তো পাবে আর-কোনো এক বাসা—  
মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকে অসম্ভবের আশা।  
অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি—  
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।

তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট বোঝাটাকে,  
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।  
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে—  
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধুলির তলে।  
সুধাই যবে কোন্ দেশেতে যাবে,  
মুখে ক্ষণেক চায় সঙ্করণ ভাবে—  
কয় সে দ্বিধায়, ‘কী জানি ভাই, হয়তো আলম্‌ডাঙা,  
হয়তো সান্‌কিডাঙা,  
কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী।’  
গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,  
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি—  
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,  
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে।  
গভীর নিশ্বাস ফেলে  
চুপটি ক’রে ভাবে,  
এমন করে আর কতদিন যাবে।  
দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্জাটে  
তাদের বেলা কাটে।  
তারা এখন আর কি মনে রাখে  
এতবড়ো অদরকারি তাকে।

চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপসা যে তার মন—  
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।  
স্টেশন-মুখে গেল চলে পিছনে গ্রাম ফেলে,  
রাত থাকতে—পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।  
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে  
পথের ধারে বসে পড়ে—শূন্য থাকে চেয়ে।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪  
আলমোড়া